বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণী ॥

ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলিকে প্রধানতঃ **চার ভাগে** বিভক্ত করা হয়ে থাকে—(১) **তন্ত্রী** বা তত ; (২) **সুষির,** (৩) **অবনদ্ধ** বা **আনদ্ধ** বা বিতত ; এবং (৪) **ঘন** ।

তন্ত্রীবাদ্য বা তত-বাদ্য—প্রাচীনকালে বীণাগুলিতে তারের বদলে তন্ত্রী বা তাঁত (জন্তুর নাড়ী শুকিয়ে তৈরী শক্ত সূতোর মতন) ব্যবহার করা হতো তাই এই জাতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলির নাম হয়েছে তন্ত্রীবাদ্য বা তত-বাদ্য। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, প্রাচীন কালে (ভারতে মুসলিম রাজত্ব শুরু হবার আগে) সমস্ত তন্ত্রীবাদ্যকেই **'বীণা'** বলা হতো। মধ্যযুগে **ব্যবহার অনুসারে বীণাবাদ্য-গুলি ছিল তিন প্রকার**—(ক) **পরিবাদিনী,** (খ) **গানানুসারিণী** এবং (গ) **অবঘোষ** ।

'পরিবাদিনী' জাতীয় বীণাগুলি এককভাবে রাগ-রাগিণী বাজানোর জন্য ব্যবহৃত হতো। এখন যেমন, সেতার, সরোদ, বেহালা, বীণ্, সুরবাহার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রগুলি হয়ে থাকে। 'গানানুসারিণী' বীণাগুলি কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য ব্যবহার করা হতো। এখন যেমন সারেঙ্গী, এস্রাজ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। 'অবঘোষ' জাতীয় বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে, যে-সব বাদ্যযন্ত্রগুলি থেকে রাগ-রাগিণী বাজানো যায় না বটে, কিন্তু কতগুলি বিশেষ স্বর অনবরত নির্গত হয়, যার ফলে রাগের জন্য প্রয়োজনীয় স্বরগুলির সূক্ষ্মরূপ সম্পর্কে গায়ক-বাদকগণ সর্বদা সতর্ক থাকতে পারেন। **বর্তমানকালের তানপুরা এই জাতীয় যন্ত্র। বৈদিক যুগে ৩ তন্ত্রী-বিশিষ্ট 'বাণ'** ছিল অবঘোষ জাতীয় বীণা। প্রাচীন যুগে বহুতন্ত্রী বিশিষ্ট স্বরমণ্ডল জাতীয় অনেক বীণা ছিল। তাদের মধ্যে **'মত্তকোকিলা'** ছিল ২১ তন্ত্রীযুক্ত বীণা, যা দিয়ে প্রাচীনকালের গায়ক-বাদকগণ খুব সহজেই যে-কোনো রাগের (গ্রাম-মূর্ছনা অনুযায়ী) স্বরগুলির সূক্ষ্মরূপ বুঝতে পারতেন। অবঘোষ জাতীয় বীণা সাধারণতঃ

আঙ্গুল ঘসে ঘসে বাজাতে হতো। মধ্যযুগে ৩ বা ২ তন্ত্রী-বিশিষ্ট **'ঘিউটী'** বা **'অঘিটী'**, **'অর্ধবীণা'** ইত্যাদি অবঘোষ জাতীয় বীণা ছিল। আমীর খুস্রো এ জাতীয় একটি যন্ত্র ব্যবহার করতেন তার নাম **'দণ্ডী'** বা **'ডাণ্ডী'**।

বাজানোর পদ্ধতি অনুসারে তত-বাদ্যগুলিকে আবার ২ ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) **প্রহার বাদ্য** এবং (খ) **ঘর্ষণ বাদ্য**। প্রহার বাদ্য মানে যে-সব তত-বাদ্য আঙ্গুলের আঘাত দ্বারা বাজানো হয়। যেমন, সেতার, সরোদ, বীণা ইত্যাদি। প্রাচীনকালে আঙ্গুলের বড় নখ দিয়ে বাজানো হতো। মধ্যযুগে **মেজ্‌রাব্‌** এবং **জওয়া** দিয়ে আঘাত করার রীতি প্রচলিত হয়। মেজ্‌রাব্‌ হচ্ছে তারের আংটি জাতীয় জিনিষ; সেতার, বীণা ইত্যাদি বাজাতে ব্যবহার করা হয়। জওয়া সাধারণতঃ নারকেলের খোল, চন্দন-কাঠ এবং বাঁশের টুকরো থেকে তৈরী হয়। প্রাচীনকালে এই **জওয়াকে 'কোণ্‌'** বলা হতো। জওয়া দিয়ে সরোদ, রবাব, দোতারা ইত্যাদি বাজানো হয়।

ঘর্ষণ বাদ্য বলতে বোঝায় যে-সব তত-বাদ্য **'ছড়্‌'** দিয়ে বাজানো হয়। যেমন বেহালা, এস্রাজ, সারঙ্গী ইত্যাদি বাজনা। 'ছড়্‌' হচ্ছে, একটি সরু কাঠের দণ্ড ২ ফুট বা ২½ ফুট লম্বা, এবং এই দৈর্ঘ পরিমাণ একগুচ্ছ ঘোড়ার ল্যাজের চুল এর সঙ্গে লাগানো থাকে।

উপরোক্ত প্রকার শ্রেণী-বিভাগ ছাড়াও ততবাদ্যগুলিকে আরো দু'ভাবে বিভক্ত করা যায়—(ক) **সারিকা-যুক্ত** এবং (খ) **সারিকা-বিহীন**। 'সারিকা' কথার অর্থ পর্দ্দা বা ঘাট। সেতার, এস্রাজ ইত্যাদি বাজনাগুলি হলো সারিকা-যুক্ত বাদ্য এবং বেহালা, সারঙ্গী, সরোদ, রবাব এবং কিছু কর্ণাটকী বীণা আছে, যাদের বলা হয় সারিকা-বিহীন ততবাদ্য।

প্রাচীনকালে' বীণা'-কে প্রধানতঃ ২ ভাগে বিভক্ত করা হতো—(১) **শ্রুতি-বীণা** এবং (২) **স্বর-বীণা**। 'শ্রুতি-বীণা' দিয়ে শুধুমাত্র স্বর ও শ্রুতির মান ও অবস্থান নির্ণয় করা হতো, রাগ বাজানো হতো না। সুতরাং তা দিয়ে গান বাজানো যেতো না। 'স্বর-বীণা' দিয়ে স্বর উৎপাদন করা যেতো। স্বর-বীণার ৩ প্রকার ভেদের অর্থাৎ পরিবাদিনী, গানানুসারিণী এবং অবঘোষ-এর কথা আগেই বলা হয়ে গেছে।

গঠন অনুসারেও প্রাচীন বীণাগুলি ছিল দু'প্রকার—(ক) **ধনুরাকৃতি** ও (খ) **দণ্ডাকৃতি**। ধনুরাকৃতি বীণাই হচ্ছে প্রাচীনতম বীণা, যাতে প্রতিটি স্বরের জন্য একটি করে তন্ত্রী থাকতো। ধনুরাকৃতি বীণার একপাশে একটি ছোট **ধ্বনিকোষ** থাকতো। 'দণ্ডাকৃতি' বীণার দু'টি প্রধান অংশ থাকে—দণ্ড এবং তুম্বা বা লাউ। তুম্বাটি হলো ধ্বনিকোষ। বর্তমানে আমরা যে সেতার, সরোদ, বেহালা ইত্যাদি যতপ্রকার ততশ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র দেখি, এগুলি সবই দণ্ডাকৃতি বীণা।

ঘন বাদ্য ॥

এখানে 'ঘন' শব্দের অর্থ কঠিন পদার্থ। মোটা কাঠ বা ধাতুর তৈরী তাল বাদ্যকেই ঘন বাদ্য বলে। ঘন-বাদ্য সাধারণতঃ কাঠ বা ধাতুর দণ্ড বা পাত দিয়ে আঘাত করে বাজাতে হয়। প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রে নানাপ্রকার ঘনবাদ্যের উল্লেখ আছে, তাদের মধ্যে তাল (থালার মতো), কাংসতাল, ঘণ্টা, ক্ষুদ্রঘন্টিকা, জয়ঘণ্টা, কম্রা (ফাঁপা খয়ের কাঠের তৈরী) ও শুক্তিপট্ট (শ্রীপর্ণী গাছের কাঠ থেকে তৈরী চৌকো পাতের ওপরে ও নীচে লোহার দণ্ডের ওপর ছোট ছোট চাকা লাগানো)।

ঘনবাদ্য দ্বারা প্রাচীনকালে গান্ধর্ব বা মার্গ সঙ্গীতের তালমাত্রা রক্ষা করা হতো। বর্তমানে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ঘনবাদ্য ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু কীর্তন গানে খঞ্জনী ব্যবহার করা হয় তালমাত্রা রক্ষার জন্য।